أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(Book# 114/M) www.motaher21.net

وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتٰبَ

"অথচ তারা কিতাব পড়ে। "

" Though they both recite the Scripture."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১১৩

وَ قَالَتِ الْیَهُوْدُ لَیْسَتِ النَّصٰرٰی عَلٰی شَیْءٍ ۪ وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰی لَیْسَتِ الْیَهُوْدُ عَلٰی شَیْءٍ ۙ وَّ هُمْ یَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فِیْمَا كَانُوْا فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ

ইহুদিরা বলে, খৃস্টানদের কাছে কিছুই নেই। খৃস্টানরা বলে ইহুদিদের কাছে কিছুই নেই। অথচ তারা উভয়ই কিতাব পড়ে। আর যাদের কাছে কিতাবের জ্ঞান নেই তারাও এ ধরনের কথা বলে থাকে। এরা যে মত বিরোধে লিপ্ত হয়েছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ এর চূড়ান্ত মীমাংসা করে দেবেন।

১১৩ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

ইবনু আবি হাতিম ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন নাজরানের খ্রিস্টান প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আগমন করল তখন ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ এসে তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়ে গেল। তখন রাফে বিন হুরাইমালা বলল- তোমরা কোন ধর্মের ওপরই নও। কেননা তোমরা ঈসা ও ইঞ্জিলের সাথে কুফরী করেছ। তখন একজন নাজরানবাসী ইয়াহূদীদেরকে বলল- তোমরাও কোন ধর্মের ওপরই নও। কেননা তোমরা মূসা (আঃ)-এর নবুওয়াত ও তাওরাতকে অস্বীকার করেছ। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীর ইবনে কাসীর ১/৩৩৮, লুবাবন নুকূল ফি আসবাবে নুযূল, পৃঃ ২৭)

অর্থাৎ ইয়াহূদীরা তাওরাত পড়ত। তাতে মূসা (আঃ)-এর জবানে ঈসা (আঃ)-এর সত্যায়ন বিদ্যমান, তা সত্ত্বেও ইয়াহূদীরা ঈসা (আঃ) কে অস্বীকার করে। খ্রিস্টানদের কাছে ইনজিল বিদ্যমান, তাতে মূসা (আঃ) এবং তাওরাত যে আল্লাহ তা ‘আলার পক্ষ হতে আগত সে কথার সত্যায়ন রয়েছে, তা সত্ত্বেও এরা ইয়াহূদীদেরকে কাফির মনে করে। এ হল ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের পরস্পরের প্রতি হিংসার বহিঃপ্রকাশ, যার কারণে তারা একে অপরকে পথভ্রষ্ট ও কাফির বলে।

(كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ)

‘এভাবে যারা জানে না, তারাও ওদের কথার মত কথা বলে থাকে’ অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মোকাবেলায় আরবের মুশরিকরা নিরক্ষর (অশিক্ষিত) ছিল। আর এ জন্যই তাদেরকে ‘অজ্ঞ’ বলা হয়েছে। কিন্তু তারা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের মত এ মিথ্যা ধারণায় মত্ত ছিল যে, তারাই নাকি হক্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ জন্যই তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সাবেয়ী বা বেদীন বলত।

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন: কারা সঠিক দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর কারা প্রতিষ্ঠিত নয় তা নিয়ে নিজেদের মাঝে ঝগড়া করার প্রয়োজন নেই বরং তিনি কিয়ামতের দিন এ বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন। যেমন অন্যত্র বলেন:

(اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئِيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا۝ اِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ۝ اِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ)

“যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক হয়েছে ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী।” (সূরা হজ্জ ২২:১৭)

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ)

‘ ‘আর তার চেয়ে বড় জালিম আর কে আছে’ ’ আয়াতের শানে নুযূল: এর শানে নুযূলের ব্যাপারে দু’টি মত পাওয়া যায়। যথা:

১. ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন উমরা করতে যান তখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে যে বাধা প্রদান করেছিল, সে ব্যাপারে নাযিল হয়। এর প্রমাণ বহন করে এ বাণী:

(هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)

“এরাই তো ঐ লোক, যারা কুফরী করেছে ও তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম থেকে ফিরিয়ে রেখেছে” (সূরা ফাতহ ৪৮:২৫)

এ অর্থে মাসজিদ ধ্বংস করার অর্থ হলো: মাসজিদে ইবাদত করতে বাধা দেয়া।

২. বখতে নসর ও অন্যান্যরা যে বাইতুল মাকদাসকে নষ্ট ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছিল সে ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। এর প্রমাণ বহন করে আল্লাহ তা ‘আলার বাণী:

(فَإِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْۤءُا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا)

“অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে আমি আমার বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম তোমাদের মুখমণ্ডল কালিমাচ্ছন্ন করার জন্য, প্রথমবার তারা যেভাবে মাসজিদে প্রবেশ করেছিল পুনরায় সেভাবেই তাতে প্রবেশ করার জন্য এবং তারা যা অধিকার করেছিল তা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য।” (সূরা ইসরা ১৭:৭) (আযওয়াউল বায়ান ১/৮৯)

প্রথম বর্ণনাটি অধিক গ্রহণযোগ্য। আর এটাই অধিকাংশ মুফাসসিরগণ বর্ণনা করেছেন। ইবনু কাসীরেও এ বর্ণনা আছে। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

যারা মাসজিদে ইবাদত করতে বাধা দেয় ও মাসজিদ ধ্বংস করে তারা কারা? এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়: তবে সঠিক হল তারা আরবের মুশরিকগণ। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

তারা যারাই হোক তাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে অপমান আর আখিরাতে রয়েছে মহা শাস্তি।

(أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَآ إِلَّا خَا ئِفِيْنَ)

এ ধরণের ব্যক্তিদেরকে ভীত অবস্থায়ই তাতে প্রবেশ করা উচিত” এখানে শব্দগুলো সংবাদমূলক হলেও উদ্দেশ্য হল আদেশ। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা ‘আলা তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠা ও বিজয় দান করবেন তখন তোমরা মুশরিকদেরকে সেখানে সন্ধি ও জিযিয়া-কর ছাড়া প্রবেশ বা অবস্থান করার অনুমতি দেবে না।

তাই ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা দিলেন, আগামী বছর থেকে কোন মুশরিক কাবায় হজ্জ ও উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী হা: ৩৭৯) তবে যার সাথে চুক্তি আছে সে চুক্তির সময় পর্যন্ত এখানে থাকার অনুমতি পাবে।

কেউ বলেছেন: এটা একটা সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী যে, অতি সত্বর মুসলিমরা জয়লাভ করবে এবং মুশরিকরা এ ভেবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রবেশ করবে যে, আমরা মুসলিমদের ওপর জুলুম-অত্যাচার করেছি তার বদলায় হয়তো তারা আমাদেরকে শাস্তি দিতে ও হত্যাও করতে পারে। বলা বাহুল্য অতি সত্বর এ সুসংবাদ বাস্তবে রূপান্তরিত হয়।

ইয়াহুদী হোক অথবা নাসারা কিংবা মুসলিম - যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেদেরকে জান্নাতের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে নেয়, সে আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না; আসল সত্যের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। এসব নামের উপর ভরসা করে কেউ আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাকে। প্রত্যেক নবীর শরীআতেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে সৎকর্মের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। তাওরাতের যুগে যেসব কাজ-কর্ম মূসা ‘আলাইহিস সালাম ও তাওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, তাই ছিল সৎকর্ম। তদ্রূপ ইঞ্জীলের যুগে নিশ্চিতরূপে তা-ই ছিল সৎকর্ম, যা ঈসা ‘আলাইহিস সালাম ও ইঞ্জিলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখন কুরআনের যুগে ঐসব কাজ-কর্মই সৎকর্মরূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী এবং তার মাধ্যমে আসা গ্রন্থ কুরআনুল কারীমের হেদায়াতের অনুরূপ।

মোটকথা, ইয়াহুদী ও নাসারাদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এই যে, উভয় সম্প্রদায় মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলছে, তাদের কেউই জান্নাতের ইজারাদার নয়। ভুল বুঝাবুঝির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, ওরা দ্বীনের আসল প্রাণ ও বিশ্বাস, সৎকর্মকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে ইয়াহুদী আর কোন সম্পপ্রদায়কে নাসারা নামে অভিহিত করেছে।

কুরআনুল কারীমে আহলে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহ্‌র ফয়সালা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলিমদেরকে সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে একথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলিম, প্রত্যেক অফিসে ও রেজিষ্টারে আমাদের নাম মুসলিমদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদেরকে মুসলিম বলি, সুতরাং জান্নাত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মুসলিমদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই। এ ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবী করলে, মুসলিমরূপে নাম লিপিবদ্ধ করালে অথবা মুসলিমের ঔরসে কিংবা মুসলিমদের আবাসভূমিতে জন্ম গ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলিম হয় না, বরং মুসলিম হওয়ার জন্য পরিপূর্ণভাবে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য। ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ । দ্বিতীয়তঃ সৎকর্ম অর্থাৎ সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করাও জরুরী।

ইয়াহুদীদের প্রতারণা, আমিত্ব এবং মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে ভীষণ সতর্ক বাণী

অত্র আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেও কিছুই মনে করতো না এবং স্পষ্টভাবে বলতো যে, তারা ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে যাবে না। সূরাহ্‌ মায়িদায় তাদের নিম্নরূপ একটা উক্তিও বর্ণিত হয়েছেঃ

﴿نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَ اَحِبَّآؤُه﴾

আমরা মহান আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। (৫ নং সূরা মায়িদা, আয়াত নং ১৮)

তাদের এ কথার উত্তরে ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘তাহলে কিয়ামতের দিন তোমাদের ওপর শাস্তি হবে কেন?’ অনুরূপভাবে ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের উক্তি নিম্নরূপও ছিলোঃ ‘আমরা কয়েকটা দিন জাহান্নামে অবস্থান করবো।’ তাদের এ কথার উত্তরে মহান আল্লাহ বলেন تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ তাদের এই দাবীও দালীল বিহীন। এভাবেই এখানেও তিনি তাদের একটা দাবী খণ্ডন করে বলেনঃ ‘দালীল উপস্থিত করো দেখি?’ তাদের অপারগতা সাব্যস্ত করে পুনরায় মহান আল্লাহ বলেনঃ হ্যাঁ, যে কেউই মহান আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে ইখলাসের সাথে সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে, সে পূর্ণভাবে তার প্রতিদান লাভ করবে।’ যেমন তিনি অন্যত্র বলেনঃ

﴿فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ﴾

‘তারা যদি তোমার সাথে কলহ করে তাহলে তুমি বলোঃ আমি ও আমার অনুসারীগণ মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছি। (৩ নং সূরা আল ‘ইমরান, আয়াত নং ২০)

মোট কথা, দু’ টি শর্তের ওপর প্রত্যেক ‘আমল গ্রহণযোগ্য। তা হলো অন্তরের বিশুদ্ধতা ও সুন্নাতের অনুসরণ। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই ‘আমলকে গ্রহণযোগ্য করতে পারে না যে পর্যন্ত না সে সুন্নাতের প্রতি অনুগত থাকে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"

‘যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যার ওপর আমার নির্দেশ নেই তা গ্রহণীয় নয়।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহ মুসলিম ৩/১৩৪৪, সুনান আবূ দাউদ-৪/৪৬০৬, সুনান ইবনে মাজাহ-১/১৪) সুতরাং ‘সংসার ত্যাগ’ কাজটি বিশুদ্ধ অন্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সুন্নাতের বিপরীত বলে গ্রহণীয় নয়। তদ্রূপ ‘আমল সম্পর্কে কুর’ আন মাজীদে ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿وَ قَدِمْنَاۤ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا﴾

আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবো। (২৫ নং সূরা ফুরকান, আয়াত নং ২৩) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً١ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا﴾

‘যারা কুফরী করে, তাদের ‘আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকা সাদৃশ্য; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে এর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে এটা কিছু নয়।’ (২৪ নং সূরা নূর, আয়াত নং ৩৯) অন্য স্থানে রয়েছেঃ

﴿وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ خَاشِعَةٌۙ۝۲ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌۙ۝۳ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةًۙ۝۴ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ﴾

সেদিন বহু মুখমণ্ডল অবনত হবে; কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে; তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে; তাদেরকে উত্তপ্ত প্রস্রবণ হতে পান করানো হবে। (৮৮ নং সূরা গাশিয়াহ, আয়াত নং ২-৫)

এটাও স্মরণীয় বিষয় যে, বাহ্যতঃ কোন কাজ সুন্নাতের অনুরূপ হলেও ঐ ‘আমলে অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য না থাকার কারণে উক্ত ‘আমলও প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে। কপট ও মুনাফিকদের অবস্থাও এরূপই। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ١ۚ وَ اِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى١ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا﴾

‘নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মহান আল্লাহ্‌র সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে ঐ প্রতারণা প্রত্যাপর্ণ করছেন; এবং যখন তারা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন লোকদেরকে দেখানোর জন্য অলসভাবে দণ্ডায়মান হয়ে থাকে এবং মহান আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।’ (৪ নং সূরা নিসা, আয়াত নং ১৪২) তিনি আরো বলেনঃ

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَۙ۝۴ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَۙ۝۵ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَۙ۝۶ وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ﴾

‘সুতরাং পরিতাপ সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানোর জন্যে এটা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট ছোট সাহায্য দানে বিরত থাকে।’ (১০৭ নং সূরা মা ‘ঊন, আয়াত নং ৪-৭) অন্যত্র ইরশাহ হচ্ছেঃ

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا﴾

‘সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ‘ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।’ (১৮ নং সূরা কাহফ, আয়াত নং ১১০) অন্যত্র তিনি বলেনঃ

‘তাদেরকে তাদের রাব্ব পূর্ণ প্রতিদান দিবেন এবং ভয় ও সন্ত্রাস হতে রক্ষা করবেন। পরকালে তাদের কোন ভয় নেই এবং দুনিয়া ত্যাগ করতে তাদের কোন দুঃখ নেই।’

অহঙ্কার ও বিদ্বেষ বলে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা একে-অপরের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়

মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَیْءٍ۪ وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَیْءٍۙ وَّ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ﴾

‘আর ইয়াহুদীরা বলেঃ খ্রিষ্টানরা কোন বিষয়ের ওপর নেই এবং খ্রিষ্টানরা বলে, ইয়াহুদীরও কোন বিষয়ের ওপর নেই অথচ তারা গ্রন্থ পাঠ করে।’ নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধিরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আগমন করে তখন ইয়াহুদী পন্ডিতেরাও আসে। অতঃপর তারা একদল অপর দলকে পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করে। রাফী ‘ ইবনু হুরাইমালা বলেঃ তোমরাতো কোন কিছুরই অনুসরণ করো না। সে ‘ঈসা (আঃ)-কে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিলকেও অস্বীকার করে। তখন নাজরান থেকে আগত খ্রিষ্টান লোকটি ইয়াহুদীকে বললোঃ বরং তোমরাই কোন কিছুকে অনুসরণ করছো না। সেও

ইয়াহুদী লোকটির মতো মূসা (আঃ) কে অস্বীকার করলো এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতকেও অস্বীকার করলো। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৩৯)

মহান আল্লাহ এখানে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তারা তাদের কিতাবে উভয়ের কিতাব ও নবী সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও একে অপরকে অস্বীকার করে। ইয়াহুদীরা ‘ঈসা (আঃ) কে অস্বীকার করছে, অথচ তাদের কিতাব তাওরাতে মূসা (আঃ)-এর যবানে ‘ঈসা (আঃ)-এর আগমন এবং তাঁকে স্বীকৃতি দানের আদেশ করা হয়েছে। এছাড়া তাদের কিতাব ‘গসপেল’ এ মূসা (আঃ) যে নবী ছিলেন এবং তাঁর প্রতি যে মহান আল্লাহ্র তরফ থেকে তাওরাত নাযিল করা হয়েছিলো সেই কথার সাক্ষ্য রয়েছে। তথাপি তারা একে অপরকে অস্বীকার করছে। অথচ উভয় দলই আহলে কিতাব। তাওরাতের মধ্যে ইঞ্জিলের এবং ইঞ্জিলের মধ্যে তাওরাতের সত্যতার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাদের এসব কথা একেবারেই বাজে ও ভিত্তিহীন।

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘মহান আল্লাহ তাদের মতবিরোধের ফয়সালা কিয়ামতের দিন করবেন, যেদিন কোন অত্যাচার ও বল প্রয়োগ থাকবে না।’ যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِـِٕيْنَ وَ النَّصٰرٰى وَ الْمَجُوْسَ وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْۤا١ۖۗ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهِيْدٌ﴾

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন; নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের ওপর সাক্ষী। (২২ নং সূরা হাজ্জ, আয়াত নং ১৭)

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা বলেনঃ

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ١ؕ وَ هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ﴾

বলোঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞ। (৩৪ নং সূরা সাবা, আয়াত নং ২৬)

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১১৪

وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ یُّذْكَرَ فِیْهَا اسْمُهٗ وَ سَعٰی فِیْ خَرَابِهَاؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ یَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَآئِفِیْنَ۬ؕ لَهُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَّ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیْمٌ

আর তার চাইতে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর ঘরে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে মানুষকে বাধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়? এই ধরনের লোকেরা এসব ইবাদাতগৃহে প্রবেশের যোগ্যতা রাখে না আর যদি কখনো প্রবেশ করে, তাহলে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে। তাদের জন্য রয়েছে এ দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে বিরাট শাস্তি।

১১৪ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] যারা মসজিদে আল্লাহর যিকর করতে বাধা দান করেছিল, তারা কারা? তাদের ব্যাপারে মুফাসসিরদের দু'টি মত রয়েছে। একটি মত হল, এ থেকে খ্রিষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। যারা রোমসম্রাটের সাথে সাথ দিয়ে ইয়াহুদীদেরকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসে নামায পড়তে বাধা দিয়েছিল এবং তার বিনাশ সাধনে অংশ নিয়েছিল। ইবনে জারীর ত্বাবারী এই মতকেই পছন্দ করেছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে কাসীর এই মতের বিরোধিতা করে বলেন, এ থেকে মক্কার মুশরিকদের বুঝানো হয়েছে। তারা নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদেরকে মক্কা থেকে বের হতে বাধ্য করেছিল এবং কা'বা শরীফে মুসলিমদেরকে ইবাদত করতে বাধা দিয়েছিল। আবার হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় একই আচরণের পুনরাবৃত্তি করে বলেছিল যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের হত্যাকারীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবো না, অথচ কা'বা শরীফে ইবাদত করতে বাধা দেওয়ার অনুমতি ও তার প্রচলন ছিল না।

[২] বিনাশ ও ধ্বংস সাধনের অর্থ শুধু এই নয় যে, তা ভেঙ্গে দেওয়া হোক বা ইমারতের অনিষ্ট করা হোক, বরং সেখানে আল্লাহর ইবাদত ও যিকর করতে না দেওয়া, শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে এবং শিরকীয় কার্যকলাপ থেকে পবিত্র করতে না দেওয়াও আল্লাহর ঘরের বিনাশ ও ধ্বংস সাধন করার শামিল।

[৩] এখানে শব্দগুলো ঘোষণামূলক হলেও এর অর্থ হবে বাঞ্ছনার। অর্থাৎ, যখন মহান আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠা ও বিজয় দান করবেন, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে সেখানে সন্ধি ও জিযিয়াকর ব্যতীত সেখানে (প্রবেশ বা) অবস্থান করার অনুমতি না দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তাই যখন ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় হল, তখন নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করলেন যে, আগামী বছর কোন মুশরিক কা'বায় এসে হজ্জ করার এবং উলঙ্গ তওয়াফ করার অনুমতি পাবে না এবং যার সাথে যে চুক্তি আছে, সে চুক্তির (নির্ধারিত) সময় পর্যন্ত সে এখানে থাকার অনুমতি পাবে। কেউ বলেছেন, এটা একটা সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী যে, অতি সত্বর মুসলিমরা জয়লাভ করবে এবং মুশরিকরা এই ভেবে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে প্রবেশ করবে যে, আমরা মুসলিমদের উপর যে যুলুম-অত্যাচার করেছি তার বদলায় হয়তো আমাদেরকে শাস্তি ও হত্যারও শিকার হতে হবে। বলা বাহুল্য, অতি সত্বর এই সুসংবাদ বাস্তবে রূপান্তরিত হয়।

ইসলাম-পূর্বকালে ইয়াহুদীরা ইয়াহইয়া ‘আলাইহিস সালাম-কে হত্যা করলে নাসারারা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাটের সাথে মিলিত হয়ে ইয়াহুদীদের উপর আক্রমণ চালায় - তাদের হত্যা ও লুন্ঠন করে, তাওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মুকাদাসে আবর্জনা ও শুকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জন-মানবহীন করে দেয়। এতে ইয়াহুদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল পর্যন্ত বায়তুল মুকাদাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তারই নির্দেশক্রমে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমস্ত সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদাস মুসলিমদের অধিকারে ছিল। অতঃপর বায়তুল-মুকাদাস মুসলিমদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় নাসারাদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ট শতকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বায়তুল-মুকাদাস পুনরুদ্ধার করেন। এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা ও বিধানও প্রমাণিত হয়।

প্রথমতঃ শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল-মুকাদ্দাস, মসজিদে হারাম ও মসজিদে-নববীর অবমাননা, যেমনি বড় যুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। এক সালাতের সওয়াব মসজিদে হারামে একলক্ষ সালাতের সমান এবং মসজিদে নববীতে এক হাজার সালাতের সমান। আর বায়তুল-মুকাদ্দাস মসজিদে পাঁচশত সালাতের সমান। এই তিন মসজিদে সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে সালাত আদায় করা উত্তম মনে করে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসা জায়েয নেই।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে যিক্‌র ও সালাতে বাধা দেয়ার যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে সালাত আদায় ও তিলাওয়াত করতে পরিষ্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের সালাত আদায় ও যিকরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

তৃতীয়তঃ মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে সালাত আদায় করার জন্য কেউ আসে না কিংবা সালাত আদায়কারীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

অর্থাৎ ইবাদাত গৃহগুলো এ ধরনের যালেমদের কর্তৃত্বে ও পরিচালানাধীনে থাকার এবং তারা এর রক্ষাণাবেক্ষণকারী হবার পরিবর্তে শাসন কর্তৃত্ব থাকা উচিত আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর প্রতি অনুগত এমন সব লোকদের হাতে আর তারাই হবে ইবাদত গৃহগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাহলে এ দুষ্কৃতিকারীরা সেখানে গেলেও কোন দুষ্কর্ম করার সাহস করবে না। কারণ তারা জানবে, সেখানে গিয়ে কোন

দুষ্কর্ম করলে শাস্তি পেতে হবে। এখানে মক্কার কাফেরদের যুলুমের প্রতিও সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের নিজেদের জাতির যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে আল্লাহর ঘরে ইবাদাত করতে বাধা দিয়েছিল।

সবচেয়ে বড় অন্যায় হলো লোকদেরকে মসজিদে আসায় বাঁধা দেয়া অথবা তাড়িয়ে দেয়া

মহান আল্লাহ্র মাসজিদে আসতে বাধা প্রদানকারী এবং মাসজিদ ধ্বংস করার জন্য প্রচেষ্টাকারী নির্ণয় করণ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ থেকে দু' টি উক্তি আছে। প্রথম উক্তি এই যে, এর দ্বারা খ্রিষ্টানকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) ও বলেন যে, তারা হলো খ্রিষ্টান। তারাও বায়তুল মুকাদ্দাসের মাসজিদে অপবিত্র জিনিস নিক্ষেপ করতো এবং জনগণকে তার ভিতর সালাত আদায় করতে বাধা প্রদান করতো। বাখতে নসর যখন বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ চালায় তখন খ্রিষ্টানরাও তার সাথে যোগ দিয়েছিলো এবং তাকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেছিল।

আর দ্বিতীয় উক্তির ভাবার্থ হচ্ছে বাধা প্রদানকারীরা হলো মুশরিক। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর মুশরিকরাও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কা 'বা ঘরে যেতে বাধা দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'যি তাওয়া' নামক স্থানে কুরবানী করতে হয়েছিল। অতঃপর তিনি মুশরিকদের সাথে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। তিনি বলেনঃ এর পূর্বে কেউ অন্য কাউকে পবিত্র কা 'বা ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়নি। যদি কেউ তার পিতা কিংবা ভাইয়ের হত্যাকারীকে দেখতে পেতো তবুও কা 'বা ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দিতো না। মুশরিকরা বললোঃ যারা আমাদের পিতা-ভাইদের বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছে তাদের কাউকে কা 'বা ঘরে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না, যতোক্ষণ আমাদের একজনও বেঁচে থাকবে। তখন মহান আল্লাহ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا আয়াত নাযিল করেন। (তাফসীর তাবারী ২/৫২১)

وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا 'আর সেগুলোর ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে' আয়াতাংশে বলা হয়েছে, যারা মহান আল্লাহ্র ঘর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে কিংবা মহান আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফ করতে অথবা হাজ্জ পালন করতে বাঁধা দেয়, তাদেরকে মুকাবিলা করো প্রাণপণ যুদ্ধ করে। ইবনে আবি হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কুরাইশরা মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করতে বাঁধা দিয়েছিলেন, এ কারণে মহান আল্লাহ ﴿ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ ﴾ এ আয়াতটি নাযিল করেন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৪১)

ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) প্রথম উক্তিটিকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি এর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন যে, মুশরিকরা কা 'বা ঘর ধ্বংস করার চেষ্টা করতো না। বরং খ্রিষ্টানরাই তা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলো। পক্ষান্তরে ইবনে যায়দ (রহঃ) ও ইবনে 'আব্বাস (রাঃ)-এর মতে দ্বিতীয় উক্তিটিই সঠিক।

উল্লেখ্য যে, যখন খ্রিষ্টানরা ইয়াহুদীদেরকে বায়তুল মাকদিসে প্রবেশ করতে বাধা দেয় তখন ইয়াহুদীরাও বে-দ্বীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের ওপর দাউদ (আঃ) ও 'ঈসা (আঃ)-এর বদ দু 'আও ছিলো। তারা অবাধ্য ও

সীমালঙ্ঘন করেছিলো। আর খ্রিষ্টানরাই ‘ঈসা (আঃ) এর ধর্মের ওপর বহাল ছিলো। অতএব বুঝা যায় যে, অত্র আয়াত দ্বারা মাক্কার মুশরিকদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এ রূপ অর্থ নেয়ার আরো একটি কারণ এই যে, ওপরে ইয়াহুদী- খ্রিষ্টানদের নিন্দার কথা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আরাবের মুশরিকদের বদ অভ্যাসের কথা বলা হচ্ছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এবং তার সাথীদেরকে মাক্কা থেকে বের করে দেয় এবং হাজ্জ-‘উমরাহ পালন করতে বাধা দিয়েছিলো।

বায়তুল্লার বিধ্বস্ত হওয়ার বর্ণনাক্রমিক তালিকা

ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) ‘মাক্কার মুশরিকরা বায়তুল্লার বিধ্বস্তির চেষ্টা করেনি’ এই উক্তির উত্তর দিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সহচরবৃন্দ (রাঃ) কে মাক্কা হতে বিতাড়িত করা এবং পবিত্র কা ‘বা ঘরে মূর্তি স্থাপন করার চেয়ে বড় ধ্বংস আর কি হতে পারে? এ প্রসঙ্গে কুর’ আনে ঘোষিত হচ্ছেঃ

﴿ وَ مَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَ هُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا كَانُوْۤا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾

‘কিন্তু তাদের কি বলার আছে যে জন্য মহান আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথে রোধ করছে, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়? আল্লাহভীরু লোকেরাই এর তত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা অবগত নয়।’ (৮ নং সূরা আনফাল, আয়াত নং ৩৪) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ ‘এসব লোক মাসজিদুল হারাম হতে বাধা দিয়ে থাকে।’ অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَ فِی النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ وَ لَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰۤى اُولٰٓىِٕكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ﴾

‘মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা মহান আল্লাহ্‌র মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন তো হতে পারে না। তারা এমন যাদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ; এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। মহান আল্লাহ্‌র মসজিদগুলো সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ও কিয়ামত দিনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সালাত কায়িম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং মহান আল্লাহ ছাড়া কাউকেও ভয় করে না। এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।’ (৯ নং সূরা তাওবাহ, আয়াত নং ১৭-১৮)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ١ؕ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَ نِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ١ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ١ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴾

‘তারাই তো কুফরী করেছিলো এবং নিবৃত্ত করেছিলো তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিলো কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হতো, যদি না থাকতো এমন কতোগুলো মু’মিন নর ও নারী যাদেরকে তোমরা জাননা, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হতো, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মদন্ত শাস্তি দিতাম। (৪৮ নং সূরা ফাত্হ, আয়াত নং ২৫) সুতরাং ঐ সব মুসলিমকে যখন মসজিদসমূহে প্রবেশ করা হতে বিরত রাখা হয়েছে, যাদের দ্বারা মসজিদসমূহ আবাদ হয়ে থাকে, তখন মসজিদগুলো ধ্বংস করতে আর বাকি রাখলো কি? মসজিদের আবাদ শুধুমাত্র বাহ্যিক রং ও চাকচিক্যের দ্বারা হয় না; বরং এর মধ্যে মহান আল্লাহ্র যিক্র হওয়া, শরী’আতের কার্যাবলী চালু থাকা, শিরক ও বাহ্যিক ময়লা হতে পবিত্র রাখাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মসজিদকে আবাদ করা।

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবেই

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ﴿ اُولٰٓىِٕكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَآىِٕفِيْنَ ﴾

‘মসজিদের মধ্যে নির্ভীকভাবে প্রবেশ করা মুশরিকদের জন্য মোটেই শোভা পায় না।’ এটা একটি খবর বা সংবাদ যা আদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতাংশের ভাবার্থ এই যে, ‘হে মুসলিমগণ! তোমরা মুশরিকদেরকে নির্ভীক চিত্তে মহান আল্লাহ্র ঘরে অর্থাৎ কা’বা ঘরে প্রবেশ করতে দিবে না, আমি যখন তোমাদেরকে তাদের ওপর জয়যুক্ত করবো তখন তোমাদেরকে এ কাজই করতে হবে।’ অতঃপর মক্কা বিজয়ের পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেনঃ

"ألا لا يَحُجَّن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عُريان، ومن كان له أجل فأجله إلى مدته"

‘এ বছরের পরে যেন কোনও মুশরিক হাজ্জ করতে না আসে এবং কেউই যেন নগ্ন হয়ে বায়তুল্লার তাওয়াফ না করে। যে সব লোকের মধ্যে সন্ধির সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে তা ঠিকই থাকবে।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ১/৩৬৯, সহীহ মুসলিম ২/৪৩৫, জামি‘ তিরমিযী ৫/৩০৯১, সুনান নাসাঈ ৫/২৯৫৮, মুসনাদে আহমাদ ২/২৯৯, ফাতহুল বারী ৩/৫৬৫) প্রকৃতপক্ষে এই নির্দেশ নিম্নের এই আয়াতেরই সত্যতা প্রমাণ করছে ও তার ওপর ‘আমল রয়েছেঃ

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ﴾

হে মু’ মিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে। (৯ নং সূরা তাওবাহ, আয়াত নং ২৮) এর ভাবার্থ এও হতে পারে যেঃ অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ মু’ মিনদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি অতি সত্বরই মু’ মিনদেরকে মুশরিকদের ওপর বিজয় দান করবেন এবং তার ফলে এই মুশরিকরা মসজিদের দিকে মুখ করতেও থর থর করে কাঁপতে থাকবে, আর তাই বাস্তবায়ন হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদেরকে উপদেশ দেন যে, ‘আরব উপদ্বীপে দু’ টি ধর্ম থাকতে পারে না এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে তথা হতে বের করে দেয়া হবে। এই উম্মাতের ঐ মহান ব্যক্তিগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঐ উপদেশ কার্যে পরিণত করে দেখিয়ে দেন। এর দ্বারা মসজিদসমূহের মর্যাদাও সাব্যস্ত হলো। বিশেষ করে ঐ স্থানের মসজিদের মর্যাদা সাব্যস্ত হলো যেখানে দানব ও মানব সবারই জন্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন।

ঐ কাফেরদের ওপর দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও অপমানও এসে গেলো এবং যেমন তারা মুসলিমদেরকে বাধা দিয়েছিলো ও দেশ হতে বিতাড়িত করেছিলো, ঠিক তেমনই তাদের ওপর পূর্ণ প্রতিশোধ নেয়া হলো। তাদেরকেও বাধা দেয়া হলো, আর পরকালের শাস্তি তো অবশিষ্ট থাকলোই। কেননা তারা বায়তুল মাকদিস এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে আহ্বান করা শুরু করেছে, উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লার প্রদক্ষিণ করেছে ইত্যাদি। কিন্তু যদি এর ভাবার্থ খ্রিষ্টানদের নেয়া হয় তাহলে এটা স্পষ্ট কথা যে, তারাও বায়তুল মাকদিসে আতঙ্ক সৃষ্টিকারীরূপে এসেছে। বিশেষ করে সেই পাথরের তারা অমর্যাদা করেছে যেই দিকে ইয়াহুদীরা সালাত আদায় করতো। আর এভাবে ইয়াহুদীরাও অমর্যাদা করেছে এবং খ্রিষ্টানদের চেয়ে অনেক বেশিই অমর্যাদা করেছে।

দুনিয়ার অপমানের অর্থ হচ্ছে ইমাম মাহদী (আঃ) এর যুগের অপমান এবং মুসলিমদেরকে জিযিয়া কর দিতে বাধ্য হওয়ার অপমানও বটে। হাদীসে একটি দু ‘আ এসেছেঃ

اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

‘হে মহান আল্লাহ! আমাদের সমস্ত কাজের পরিণাম ভালো করুন এবং আমাদেরকে দুনিয়ার অপমান ও আখিরাতের শাস্তি হতে মুক্তি দান করুন।’ (হাসান। মুসনাদে আহমাদ ৪/১৮১, আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়েদ ১০/১৭৮, মুসতাদরাক হাকিম ৩/৫৯১)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. দীন তিন স্তরের (ঈমান, ইসলাম ও ইহসান) ওপর প্রতিষ্ঠিত, এটাই জাহান্নাম হতে নাজাত ও জান্নাত লাভের একমাত্র মাধ্যম।

২. মাসজিদ ধ্বংস করা অথবা ইবাদতে বাধা দেয়া বড় ধরণের অপরাধ।

৩. কাফির-মুশরিকদের থেকে মাসজিদ রক্ষা করা ওয়াজিব।

৪. মুসলিমদের অন্যান্য জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব জানলাম।